দিনবদলের সনদের অঙ্গীকার ও বাস্তবতা

ড. বদিউল আলম মজুমদার, সম্পাদক, সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক (৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১১)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত মহাজোট সরকারের দুই বছর পূর্ণ হয়েছে। ‘দিনবদলের’ অঙ্গীকারের ভিত্তিতে সরকার ক্ষমতায় এসেছে। গত ৬ জানুয়ারি জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের গত দুই বছরের সফলতা তুলে ধরে বলেন: ‘দুই বছরে আমরা যত কাজ করেছি এটা কেবল এই সরকারের পক্ষেই সম্ভব। অতীতে কোনো সরকারের পক্ষেই এত উন্নয়ন করা সম্ভব হয়নি।’ আমাদের বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালদা জিয়া ৯ জানুয়ারির সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যকে অসত্য ও বিকৃত তথ্যে ভরা বলে দাবি করেছেন। পরবর্তীতে সরকারের পক্ষ থেকে বিরোধী দলীয় নেত্রীর বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের অভিযোগ আনা হয়। দিনবদলের সনদ বাস্তবায়নে আমরা আসলে কোথায়?

দিনবদলের সনদে মোট ২৩টি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী চিহ্নিত করা হয়, যার মধ্যে পাঁচটিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের খাতগুলো হলো: দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ ও বিশ্বমন্দার প্রভাব মোকাবিলা; দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা; বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সমস্যা নিরসনে উদ্যোগ গ্রহণ; দারিদ্র্য ও বৈষম্য নিরসন; সুশাসন প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ এগুলো অর্জনের ক্ষেত্রে সরকারের সর্বাধিক এবং সর্বাগ্রে মনযোগী হওয়ার কথা। এ পাঁচটি অগ্রাধিকারকে ভেঙ্গে সরকারের সুস্পষ্ট অঙ্গীকারগুলো এবং তার বিপরীতে অর্জনগুলো আমরা নিম্নে তুলে ধরছি, যাতে সরকারের সফলতা-ব্যর্থতা সম্পর্কে পাঠক নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে। একইসাথে অঙ্গীকারগুলো অর্জনের লক্ষ্যে সরকার আগামী তিন বছরের কর্মসূচী চিহ্নিত করতে পারে।

অঙ্গীকার	বাস্তবায়নের অগ্রগতি
১. দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ ও বিশ্বমন্দার মোকাবেলা	
নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম কমিয়ে জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আনা এবং মূল্য স্থিতিশীল রাখা।	নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম স্থিতিশীল রাখা সম্ভব হচ্ছে না। তবে সরকারের দাবি, আন্তর্জাতিক দাম বিশেষত পাশ্ববর্তী দেশের তুলনায় দেশের চাল, ডাল, তেলের দাম যৌক্তিক পর্যায়ে রয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে অবশ্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি অব্যাহত রয়েছে। ফলে সরকারের খাদ্য ক্রয়ের ব্যায় বর্তমান অর্থ বছরে ৪২ শতাংশ বাড়বে। (*দি ডেইলি স্টার*, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১১)। টিসিবি’র হিসাবে ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে চিকন চালের দাম ৪২ থেকে ৫২ টাকায় ঠেকেছে। এক মাসে দাম বেড়েছে প্রায় ৭ শতাংশ। গত এক বছরের হিসাবে মোটা চালের দাম বেড়েছে প্রায় ৩৩ শতাংশ (*দৈনিক প্রথম আলো*, ১ ফেব্রুয়ারি ২০১১)। *দৈনিক প্রথম আলো*’র (২৮ ডিসেম্বর, ২০১০) আরেকটি প্রতিবেদন অনুযায়ী ক্যাব সূত্রে জানা যায়, এক বছরে চাল, আটা ও পেয়াজের দাম বেড়েছে ৩০ শতাংশের বেশি। চালের দাম বেড়েছে ২৩.১৮ শতাংশ, আটা ২৯.৫৫ শতাংশ, ভোজ্যতেল ১৮.১৩ শতাংশ, পেয়াজ ৪২.৩৭ শতাংশ এবং মাংস ১২.১৬ শতাংশ। শুধু ডালের দাম ৩.৪৯ শতাংশ কমেছে। বর্তমানে চালের উৎপাদন ৩ কোটি ২০ লাখ টন এ উন্নীত হয়েছে, যা সত্ত্বেও চালের দাম ক্রমাগতভাবে বাড়ছে। এমনকি ধান কাটার মৌসুমেও। তবে চালের উৎপাদন বাড়লেও, শষ্য খাতে বৈচিত্র্য অর্জনে দেশ তেমন সফলতা দেখাতে পারেনি। ডাল, তেল বীজ ও মশলা জাতীয় শষ্যের আওতায় জমি কমেছে। আখ ও পাটের উৎপাদন নিরঙ্কুশ কমেছে। ফলে ডাল, তেল, চিনি, মসলা ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যের চাহিদা মেটাতে বিশ্ববাজারের ওপর নির্ভরশীলতা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। সরকার দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির প্রভাব রোধে ওএমএস কর্মসূচির অধীনে সুলভ মূল্যে খোলা বাজারে চাল বিক্রির কৌশল অবলম্বন করেছে। মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীর সাম্প্রতিক বক্তব্য অনুযায়ী, সরকার ‘ফেয়ার প্রাইস কার্ডে’র অধীনে কম মূল্যে চাল প্রদানের জন্য প্রতি ইউনিয়নে এক হাজার পরিবারকে টার্গেট করেছে। মোট ৪০-৪৫ লক্ষ পরিবার এ কর্মসুচির আওতায় আসবে বলে আশা করা যাচ্ছে (*দি ডেইলি স্টার*, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১১)। তবে এ ধরনের কর্মসূচি পরনির্ভরশীলতার মানসিকতার সৃষ্টি করে এবং তা কোনোভাবেই সমস্যার দীর্ঘমেয়াদী সমাধান নয়।
মজুদদারী ও মুনাফাখোরি সিন্ডিকেট ভেঙ্গে দেওয়া এবং চাঁদাবাজি বন্ধ করা।	সিন্ডিকেট সম্পর্কে সরকারের বক্তব্য ক্ষিভ্রান্তিমূলক। বাজার সিন্ডিকেটের প্রভাবের স্বীকৃতি দিয়ে কয়েকমাস আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, সিন্ডিকেটের জিম্মিদশা থেকে জনগণকে মুক্ত করতে টিসিবিকে জোরদার করতে হবে (*দৈনিক আমাদের সময়*, ১১ অক্টোবর ২০১০)। তবে জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর কালে সম্প্রতি মাননীয় বানিজ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, বাজার সিন্ডিকেট বলে দেশে কোনো গোষ্ঠী নেই (*দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১১)। টিসিবিকে শক্তিশালী করার বিষয়ে সরকারের অবস্থানও সুস্পষ্ট নয়। বর্তমান জোট সরকারের প্রথম দিকে বানিজ্যমন্ত্রী টিসিবিকে শক্তিশালী করার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন, যদিও প্রধানমন্ত্রী টিসিবিকে শক্তিশালী করার পক্ষে (*নিউ এজ এক্সট্রা*, ২০-২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯)। কিন্তু সরকার টিসিবিকে কার্যকর করার কথা বললেও, প্রতিষ্ঠানটিকে শক্তিশালী করার কোনো উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায় না, এর সুফলও জনগণের কাছে পৌঁছেনি। গণমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, সরকারের মেয়াদকাল দুই বছর অতিবাহিত হওয়ার পর এখন টিসিবি’র আইনকে সংশোধন করে প্রতিষ্ঠানটিকে কার্যকর করার উদ্যোগ শুরু হয়েছে (*দৈনিক জনকণ্ঠ*, ৭ জানুয়ারি ২০১১)। চাঁদাবাজির খবরও প্রতিনিয়ত গণমাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে। এ ব্যাপারে সরকারের কোনো সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায় না।

'ভোক্তাদের স্বার্থে ভোগ্যপণ্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ' সৃষ্টি।	সরকারের পক্ষ থেকে এ ধরনের কোনো উদ্যোগের কথা আমরা এখনো শুনিনি।
বিশ্বমন্দার প্রভাব থেকে বাংলাদেশকে রক্ষার জন্য তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলা এবং একটি টাস্কফোর্স গঠন।	তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলা এবং কোনো টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে বলে আমরা শুনিনি। তবে সরকারের পক্ষ থেকে রপ্তানীখাতের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা এবং এর ভিত্তিতে তাদেরকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু বিশ্বমন্দার কারণে বিদেশে কর্মরত যে সকল শ্রমিক চাকুরি হারিয়ে দেশে ফিরে এসেছে, তাদেরকে কোনোরূপ সহায়তা প্রদান করা হয়নি।
জনশক্তি রপ্তানী অব্যাহত রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ	দেশের মানব সম্পদ রপ্তানির হার তুলনামূলকভাবে কমে গেছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেছেন, চাহিদা কমে যাওয়ায় বিদেশে বাংলাদেশি জনশক্তি রপ্তানি কমছে। তিনি জানান, ২০০৭ সালে ৮ লাখ ৩২ হাজার ৬০৯ জন এবং ২০০৮ সালে ৮ লাখ ৭৫ হাজার ৫৫ জন কর্মী বিদেশে গিয়েছিল। ২০০৯ সালে এই সংখ্যা কমে হয় ৪ লাখ ৭৫ হাজার ২৭৮ জন। ২০১০ সালের ৯ মাসে ২ লাখ ৯১ হাজার ৯০৪ জন কর্মী বিদেশে গিয়েছেন। (*দৈনিক প্রথম আলো*, ১ নভেম্বর ২০১০)। জনশক্তি রপ্তানির হার হ্রাসের ফলে রেমিট্যান্সও আগের তুলনায় কমা শুরু করেছে। *দৈনিক ইত্তেফাকের* (৫ ফেব্রুয়ারি ২০১১) প্রতিবেদন অনুযায়ী, জানুয়ারিতে গত ডিসেম্বরের চেয়ে প্রায় ১ কোটি ডলার সম পরিমান রেমিটেন্স কম এসেছে। (ডিসেম্বর ২০১০ এ আয় ৯৬ কোটি ৯১ লাখ ডলার, জানুয়ারিতে ৯৬ কোটি ১ লাখ ডলার)। জনশক্তি রপ্তানির গুরুত্বপূর্ণ নতুন ক্ষেত্রও তেমন পাওয়া গেছে বলে শুনিনি।
২ দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা	
দুর্নীতি দমন কমিশনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে কমিশনকে শক্তিশালী করা।	দিনবদলের সনদে দুর্নীতি দমন কমিশনকে শক্তিশালী করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। কিন্তু গত ২৪ জানুয়ারি ২০১১ তারিখে দুদক আইনের সংশোধনীর খসড়া মন্ত্রী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদনের ফলে সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মামলা করার ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমতি গ্রহণে বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি এবং মিথ্যা মামলার ক্ষেত্রে বাদীর ৫ বছরের জেল ও জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। একইসাথে দুদককে স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি না দেয়ার এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান তাদের গোপন তথ্য দুদককে প্রদান করতে বাধ্য হবে না বলে সুপারিশ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন: মামলায় না জিতলেই কি ধরে নেওয়া যায় যে, মামলাটি মিথ্যা ছিল? আমাদের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, অনেক চিহ্নিত দুর্নীতিবাজও আইনের ফাঁক-ফোকর ব্যবহার করে দুর্নীতির দায় থেকে মুক্ত হয়েছে। আদালত কর্তৃক 'টেকনিক্যাল' বা যান্ত্রিক কারনে মামলা বাতিল করার পরও কি বলা যায় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি দুর্নীতিবাজ নন? এ ধরনের বিধান আইনে পরিণত হলে, মামলায় হেরে যাওয়ার ভয়ে দুদকের কর্মকর্তারা দুর্নীতির মামলা দায়েরে নিরুৎসাহিত হবেন। দুদকের চেয়ারম্যান ইতোমধ্যেই তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন যে, প্রতিষ্ঠানটিকে নখ-দন্তহীন বাঘে পরিণত করার প্রচেষ্টা চলছে।
ক্ষমতাধরদের বার্ষিক সম্পদ বিবরণ দেওয়া।	'সুশাসন প্রতিষ্ঠা' শীর্ষক অগ্রাধিকারেও বাৎসরিকভাবে ক্ষমতাধরদের সম্পদের হিসাব প্রদান ও প্রকাশ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সরকারের মেয়াদের প্রথম দিকে মাননীয় অর্থমন্ত্রী একাধিকবার নির্দিষ্ট সময়সীমা দিয়ে ঘোষণাও দিয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো যে, দিনবদলের সনদের সুস্পষ্ট অঙ্গীকার সত্ত্বেও সরকারের উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিদের সম্পদের হিসাব গ্রহণ ও প্রকাশ করার কোনো উদ্যোগই নেওয়া হয়নি। অর্থমন্ত্রী অবশ্য নিজের সম্পদের হিসাব প্রকাশ করে নিজের ব্যক্তিগত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন।
রাষ্ট্র ও সমাজের সকল স্তরের ঘুষ, দুর্নীতি উচ্ছেদ করা।	একটি বিশেষ সংসদীয় কমিটির তদন্তের ভিত্তিতে সংসদের সাবেক স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার ও চীফ হুইপের দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হলেও, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিষয়টি শুধুমাত্র দুদকের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে। সাবেক স্পীকারের দুর্নীতির কারণে সংসদের মর্যাদাহানির অভিযোগে 'সংসদীয় বিশেষ অধিকারে'র আওতায় তাঁর বিরুদ্ধে কোনোরূপ ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। উল্লেখ্য যে, এমন অপরাধের জন্য প্রতিবেশি ভারতসহ অন্যান্য দেশে সংসদ থেকে বহিস্কার করা হয়। বর্তমান সরকারের আমলে বড় ধরনের একজন দুর্নীতিবাজের শাস্তি হয়েছে বলেও আমরা শুনিনি। বরং দুর্নীতির অভিযোগে শাস্তিপ্রাপ্তরা গণহারে মুক্তি পেয়েছে। এ ব্যাপারে সরকার ও আদালতের ভূমিকা নিয়ে অনেক নাগরিকের মনে অনেক গুরুতর প্রশ্ন রয়েছে। ঘুষ প্রদান ও গ্রহণের সংস্কৃতি পুরোদমেই অব্যাহত রয়েছে। দলীয় নেতাকর্মীদেরকে ফায়দা প্রদানের লক্ষ্যে ২ কোটি টাকা পর্যন্ত মূল্যমানের সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক প্রকাশ্য দরপত্র আহ্বানের বিধান রহিত করা হয়। এ ধরনের ফায়দাতন্ত্র ও দলতন্ত্রের চর্চা দুর্নীতিরই নামান্তর।
চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, কালোটাকা ও পেশীশক্তি প্রতিরোধ ও নির্মূলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ।	চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজির বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী ও সরকারী উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিরা বারবার কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে আসছেন। কিন্তু দলীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এগুলোর লাগামহীন বিস্তার ঘটেছে। গত দুই বছরে সরকারি দলের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনগুলোর (যদিও ছাত্রলীগ ও শ্রমিকলীগকে অঙ্গ/সহযোগী সংগঠন হিসেবে অস্বীকার করা হয়) চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, দখলদারিত্ব ইত্যাদি অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে। এই সকল অপকর্ম নিয়ে অশুভ প্রতিযোগিতা অনেক সময় সহিংস আকার ধারন করছে। সকল উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আজ ছাত্রলীগের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে। কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ, বহিস্কার এবং সময় সময় দুস্কৃতিকারীদের গ্রেপ্তার ব্যতীত এসকল অপরাধী কর্মকাণ্ড বন্ধে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। *গনপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধিত) আইন*, ২০০৯-এর বিধান অনুযায়ী নিবন্ধিত দলের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন থাকা বেআইনী হলেও, এ ব্যাপারে

	কোনো উদ্যোগই গ্রহণ করা হয়নি।
প্রতি দফতরে নাগরিক সনদ স্থাপন।	অনেক প্রতিষ্ঠানেই নাগরিক সনদ প্রকাশ করা হলেও, এর কার্যকারিতা নেই বললেই চলে। কারন নাগরিক সনদে উল্লেখিত সেবা দেওয়া না হলে তার প্রতিকারের কিংবা শাস্তি প্রদানের কোনো ব্যবস্থা নেই।
সরকারি কর্মকাণ্ডের ব্যাপকভাবে কম্পিউটারায়ন করে দুর্নীতির পথ বন্ধ করা হবে।	ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার হলেও, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দুর্নীতি উচ্ছেদের তেমন কোনো উদ্যোগ দেখা যায় না। এমনকি সকল মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটও নিয়মিতভাবে আপডেট করা হয় না। আশার বিষয়, মামলা ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা আনতে ও তদারকি বাড়াতে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ই-রেজিস্টারিং পদ্ধতি চালু করেছে সুপ্রিম কোর্ট। আরও আশার কথা যে, সরকারের A2I প্রকল্পের অধীনে দেশের সকল ইউনিয়নে ওয়েব পোর্টাল সৃষ্টি করা হয়েছে, যা ভবিষ্যতে কাজে লাগাতে হবে।
৩ বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সমস্যা নিরসনে উদ্যোগ গ্রহণ	
বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সমস্যা সমাধানে একটি দীর্ঘমেয়াদী সমন্বিত জ্বালানী নীতিমালা গ্রহণ করা। ২০১৪ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সমস্যা সমাধানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে।	*ডবদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধ (বিশেষ বিধান) আইন* ৩ অক্টোবর ২০১০ সংসদে পাশ হয়েছে। যার ফলে সরকারের পক্ষে বিদেশ থেকে বিদ্যুৎ বা জ্বালানীর আমদানি ও তা সরবরাহ করা সম্ভব হবে। তবে এই কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্টদেরকে দায়মুক্ত করা হয়েছে। এ ধরনের দায়মুক্তির ফলে সরকারি ক্রয়খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রশ্নবিদ্ধ হবে। *দৈনিক যুগান্তরে*'র (৫ ফেব্রুয়ারি ২০১১) প্রতিবেদনে পিডিবির হিসাব অনুযায়ী, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১১ সারাদেশে বিদ্যুতের চাহিদা ছিল ৪ হাজার ২৫০ মেগাওয়াট। ওই দিনে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছে ৩ হাজার ৮০৮ মেগাওয়াট। তাই এখনও বিরাজমান বিদ্যুৎ ঘাটতি উল্লেখযোগ্য পরিমানের। নির্বাচনী ইশতেহারে জ্বালানি খাতের উন্নয়ন প্রাধান্য পেলেও আওয়ামী লীগ সরকারের দুই বছরে এ খাতের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় গতি পায়নি। সর্বশেষ হিসেব অনুযায়ী, দেশে উত্তোলনযোগ্য (প্রমানিত ও সম্ভাব্য মিলে) গ্যাসের পরিমান ২০.৬ ট্রিলিয়ন ঘনফুট (টিসিএফ)। এর মধ্যে প্রায় ৯ টিসিএফ তোলা হযেছে। ছোট-বড় ২৩টি গ্যাসক্ষেত্রের ৭৯টি কূপ থেকে বর্তমানে দৈনিক উত্তোলনের পরিমান ১৯৭ থেকে ২০০ কোটি ঘনফুট, যদিও দৈনিক চাহিদা ২৫০ কোটি ঘনফুট। বর্তমানে গ্যাসের বার্ষিক চাহিদা বৃদ্ধির হারও প্রায় ১০ শতাংশ। কিন্তু গত এক বছরে মাত্র ১০ কোটি ঘনফুটের মতো গ্যাসের উৎপাদন বেড়েছে (*দৈনিক প্রথম আলো* ৫ জানুয়ারি ২০১১)। দেশে এ পর্যন্ত আবিস্কৃত ৫টি খনি থেকে মোট কয়লা মজুদের পরিমান প্রায় ৩০০ কোটি (৩ বিলিয়ন) টন, যা অতি উন্নত মানের বিটুমিনাস কয়লা। এই কয়লা দিয়ে ৫০ বছর ধরে ১০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব, যদিও এমন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অভাব রয়েছে। সরকারের ২০১৫ নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনায় প্রায় ২৬০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কথা বলা হয়েছে, যে কয়লা প্রাথমিকভাবে আমদানি করা হবে। আর দেশীয় কয়লা তোলার জন্য সরকার 'জাতীয় কয়লা নীতি' প্রণয়নের প্রক্রিয়া চালাচ্ছে, যা সম্পর্কে গত দুই বছরে তেমন অগ্রগতি নেই (*দৈনিক প্রথম আলে,া* ৫ জানুয়ারি ২০১১)। দেশের প্রধান বানিজ্যিক জ্বালানি এখনো আমদানি করা তেল। কৃষি, শিল্প, বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিবহন প্রভৃতি ক্ষেত্রে জ্বালানি তেল ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে দেশে প্রতিবছর নানা ধরনের জ্বালানি তেল মিলে মোট আমদানির পরিমান প্রায় ২৮ লাখ মেট্রিক টন। নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে পর্যায়ক্রমে তা বাড়তে থাকবে (*দৈনিক প্রথম আলে,া* ৫ জানুয়ারি ২০১১)।
২০১১ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ৫ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করা।	ডবদ্যুৎ পরিস্থিতি সহনীয় হতে আরও বছর দুই সময় লাগবে বলে পর্যবেক্ষকদের ধারণা। সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের সময়ে বিদ্যুতের সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল আনুমানিক ৪০০০ মেগাওয়াট। সরকারি হিসাব মতে, দায়িত্ব গ্রহণের পর এ পর্যন্ত ১১৩১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়েছে। ২০১৬ সাল নাগাদ ১৪,৭২০ মেগাওয়াট ক্ষমতার নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সরকার, কিন্তু পুরোনো বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর উৎপাদন ক্ষমতা কমে যাওয়ার ফলে বিদ্যুতের মোট উৎপাদন বাড়ছে ধীরগতিতে। এগুলোর ক্ষমতা কতটা বাড়ানো গেছে কিংবা লোড শেডিং কতটা কমাতে পেরেছে সে বিষয়ে সরকার নিয়মিত তথ্য জানালে অগ্রগতিটা স্পষ্ট হতো। বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বিনিয়োগের জন্য পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপের ওপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা প্রদর্শন করা হয়েছে, যা বাস্তবসম্মত নয় বলে অনেকের ধারণা। এছাড়াও অনেকগুলো বিদ্যুৎ কেন্দ্রই পুরোনো, তাই ভবিষ্যতে অনেক বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে।
৪ দারিদ্র্য ও বৈষম্য নিরসন	
কৃষি ও পল্লী জীবনে গতিশীলতা আনা হবে। বয়স্ক ভাতা, দুস্থ মহিলা ভাতা, সুবিধাভোগীদের সংখ্যা কমপক্ষে দ্বিগুন করা। তরুণ উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা। বর্তমানের ৬.৫ কোটি দরিদ্রের সংখ্যা ২০১৩ সালে ৪.৫ কোটিতে নামিয়ে আনা।	কৃষিকে অগ্রাধিকার প্রদান এবং সারের দাম কমানোসহ কৃষিখাতে ভর্তূকী প্রদানের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। স্বল্পসুদে, সহজ শর্তে ও সহজে কৃষকদের ঋণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে ১০ টাকার বিনিময়ে ১ কোটি ৮২ লক্ষ কৃষক পরিবারের মধ্যে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ করা শুরু হয়েছে এবং ৯২ লক্ষ বর্গাচাষীকে ডিজেল ক্রয়ে সহায়তা বাবদ ৭৫০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে এপ্রিল পর্যন্ত সরকারি-বেসরকারিখাতে কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ৮ হাজার ৯৪৯ কোটি টাকা। সাম্প্রতিক হিসাব অনুযায়ী, দারিদ্র্যের হার ৩৮.৭ শতাংশে নেমে এসেছে। তবে প্রকৃত দরিদ্রের সংখ্যা বেড়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর সম্প্রসারণই যেন দারিদ্র্য দূরীকরণের কৌশল হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে ১৬ লক্ষ ৪ হাজার টন খাদ্য নিরাপত্তা বেষ্টনীর কর্মসূচির আওতায় বিতরণ করা হয়েছে।

	কিন্তু এ ধরনের কর্মসূচী দারিদ্র্য দূরীকরণের একটি দীর্ঘমেয়াদি কৌশল হতে পারে না। 'একটি বাড়ি একটি খামার' ও ঘরে ফেরা কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সক্ষমতায় বাংলাদেশের অবনতি ঘটেছে। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ৩ জেলায় (কুড়িগ্রাম, বরগুনা, গোপালগঞ্জ) প্রায় ৫০,০০০ প্রার্থী বাছাই করা হয়েছে, যাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। তবে দলীয় কমিটির মাধ্যমে নামের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। দারিদ্র্য রোগের উপসর্গ মাত্র, আমাদের মূল রোগ হলো সাধারন মানুষের প্রতি বৈষম্য ও বঞ্চনা। বর্তমান সরকারের আমলেও এ বৈষম্য বঞ্চনা আরও প্রকট হচ্ছে। কৃষি ও পল্লী জীবনে গতিশীলতা আনয়নের জন্য ব্যাপক বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন। কিন্তু স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা আমাদের দেশে ক্রমাগতভাবে দুর্বল হয়েছে, বর্তমান সরকারের আমলেও তা অব্যাহত রয়েছে।
কর্মসংস্থান নীতিমালা ঘোষণা ও বেকার সমস্যার সমাধান।	কর্মসংস্থান নীতিমালা ঘোষণা করা হয়েছে বলে আমরা শুনিনি। বেকারত্ব দূরীকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো শিল্পখাতের প্রসার। কিন্তু জ্বালানী ও অবকাঠামোগত সমস্যার কারণে শিল্প বিনিয়োগে আজ স্থবিরতা বিরাজ করছে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সমস্যার কারণে নতুন শিল্প স্থাপন এক প্রকার বন্ধ রয়েছে। এ কারণে নতুন কোন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হচ্ছে না। বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংযোগ বন্ধ থাকায় হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে শিল্প স্থাপন করে তা চালু করতে না পেরে উদ্যোক্তারা নিরুৎসায়িত।
৫ সুশাসন প্রতিষ্ঠা	
যুদ্ধাপরাধীদের বিচার।	ঐুদ্ধাপরাধী/মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধকর্মে লিপ্তদের বিচার প্রক্রিয়া আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে শুরু হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে সমন্বয়হীনতার অভিযোগ উঠেছে। আইনের সীমাবদ্ধা নিয়েও আন্তর্জাতিকভাবে প্রশ্ন তোলা হয়েছে।
বিচারবিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা।	অতীতের ন্যায় দলীয় অনুগতদেরকেই বিচার বিভাগে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এ ব্যাপারে স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাছাই কমিটি করার কোনো বিধান করা হয়নি। প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে জেষ্ঠ্যতা লঙ্ঘন করা হয়েছে। আপিল বিভাগে সম্ভাব্য নিয়োগের ক্ষেত্রে জেষ্ঠ্যতা লঙ্ঘনের অভিযোগে কিছু বিচারপতি পদত্যাগের হুমকি দিচ্ছেন।
বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের রায় কার্যকর ও জেলখানার চার নেতার হত্যাকাণ্ডের পুনর্বিচার।	জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকারীদের বিচার শেষ হয়েছে এবং বিচারের রায় আংশিকভাবে কার্যকর করা হয়েছে। পলাতকদের দেশে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে। জেল হত্যা মামলার বিচার এখনো শুরু হয়নি।
২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার সুষ্ঠু তদন্ত ও অপরাধীদের বিচারের ব্যবস্থা।	এ ব্যাপারে তদন্ত চলছে।
সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ শক্ত হাতে দমন করা।	সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ দমনে কঠোরতা প্রদর্শন করা হচ্ছে এবং এ ব্যাপারে কিছু অগ্রগতিও অর্জিত হয়েছে। জঙ্গীবাদের অভিযোগে অনেককে গ্রেফতার এবং বিচারের আওতায় আনা হয়েছে।
বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড বন্ধ করা।	বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড বন্ধে সরকারের প্রতিশ্রুতি থাকলেও এমন মানবতাবিরোধী ঘটনা ঘটেই চলেছে যা দেশে বিদেশে বাংলাদেশের ইমেজকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী, ২০১০ সালে ক্রসফায়ার, বন্দুকযুদ্ধ বা এনকাউন্টারের নামে দেশে ১৩৩টি বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড ঘটেছে।
আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা	আইনশৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে, যে ব্যাপারে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও দ্বিমত করতে পারেননি। পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত ছয় মাসে শুধু মহানগরের বিভিন্ন থানায় খুন, ডাকাতি, দস্যুতা, দ্রুত বিচার আইনের মামলা, বিস্ফোরক অপরাধ ও সন্ত্রাসবিরোধী মামলায় গ্রেপ্তার করা ১০৭২ জন আসামী ছাড়া পেয়েছে। জানুয়ারির প্রথম ১৫ দিনেই শুধু রাজধানীতেই ২২টি খুন হয়েছে (*দৈনিক প্রথম আলো*, ১৭ জানুয়ারি ২০১১)। অনেক সন্ত্রাসীও ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে। আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে লাল-সবুজ বাতি ব্যবহারের ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে। দলীয় বিবেচনায় অনেক অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। দলীয় বিবেচনায় এবং রাজনৈতিক হয়রানী অজুহাতে প্রায় ৭ হাজার মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে বা প্রক্রিয়ায় রয়েছে, যার মধ্যে হত্যা মামলা এবং বর্তমান সরকার আমলে দায়ের করা মামলাও রয়েছে। ১৯৯৬ সালের শেয়ার বাজার কেলেঙ্কারিতে যুক্তদের বিচারের আওতায় আনা হয়নি। সম্প্রতি শেয়ার বাজার থেকে সাধারন বিনিয়োগকারীদের স্বার্থহানি করে একটি সিন্ডিকেট কর্তৃক হাজার হাজার কোটি টাকা কারসাজির মাধ্যমে লুট করার অভিযোগ উঠেছে। বর্তমান কেলেঙ্কারিতে যুক্ত বলে যাদের সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে, তাদের প্রায় সবাই বর্তমান সরকারের আশীর্বাদপুষ্ট বা উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত এবং তাদের বিরুদ্ধে অধ্যাবধি দলীয়ভাবে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বেশ কয়েকজন মাননীয় সংসদ সদস্য মিথ্যা হলফনামা দিয়ে রাজউকের প্লটের জন্য দরখাস্ত করেছেন, যা একটি দন্ডনীয় অপরাধ। আরো কয়েকজন সংসদ সদস্য কার্যপ্রণালী বিধি লঙ্ঘন করে সংসদীয় কমিটির সদস্য হয়েছেন। একজন সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এদের কারোর বিরুদ্ধেই কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি

	এবং ক্ষমতাধররা এখনও আইনের উর্ধ্বেই থেকে যাচ্ছে, যা আইনের শাসনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।
স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন গঠন ও ন্যায়পাল নিয়োগ করা।	স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন পুনর্গঠন করা হয়েছে, যদিও কমিশনার নিয়োগে স্বচ্ছতা ছিল না এবং এ লক্ষ্যে সৃষ্ট কমিটি তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেনি। ন্যায়পাল এখনও নিয়োগ করা হয়নি।
জাতীয় সংসদ কার্যকর ও সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।	সংসদ সদস্যদের অনেকেই সংসদীয় কাজে বিমূখ – অনেকেই ব্যবসা-বাণিজ্য এবং স্থানীয় উন্নয়ন কাজে নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখছেন। সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সৃষ্ট সংসদীয় কমিটি অনেকক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয়, কিছু কমিটি তার এখতিয়ার বহির্ভূত কাজে লিপ্ত। কিছু স্পর্শকাতর বিষয়ে (যেমন, ছাত্র রাজনীতি, দলীয়করণ, শেয়ার বাজার কেলেঙ্কারি ইত্যাদি) সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলো নিরব। অতীতের ন্যায় এবারও বিরোধী দল সংসদ বর্জন করছে এবং নিয়মতান্ত্রিক পথের পরিবর্তে তারা রাজপথেই সমস্যা !সমাধানে'র পথ অবলম্বন করেছে। বলা বাহুল্য যে, রাজপথে সমস্যার সমাধান হয় না, বরং তা ব্যাপক ও প্রকট আকার ধারন করে এবং সহিংস রুপ নেয়। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার পরিবর্তে জাতীয় সংসদের অনেক সময় ব্যয় হয় নেতানেত্রীদের বন্দনায় এবং অনাকাঙ্ক্ষিত বিতর্কে। উদাহরণস্মরুপ, গত দুই যুগে প্রায় ১০,০০০ মূলতবী প্রস্তাবের মধ্যে মাত্র ৪টি নিয়ে সংসদে আলোচনা হয় – বর্তমান সংসদে একটিও আলোচনা হয়নি (*দৈনিক প্রথম আলো*, ১৯ মার্চ ২০১০)।
নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচন পদ্ধতির চলমান সংস্কার অব্যাহত রাখা। প্রবাসী বাঙ্গালীদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা। যোগ্যতা, জ্যেষ্ঠতা ও মেধার ভিত্তিতে সব নিয়োগ ও পদোন্নতি নিশ্চিত করা।	নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সংস্কার অব্যাহত রাখা হয়নি। বরং হয়েছে তার উল্টো। যেমন, *গনপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধিত) আইন* থেকে 'না' ভোটের বিধান বাদ দেওয়া হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে প্রণীত অধ্যাদেশে দলের তৃণমূলের সদস্যদের সুপারিশের ভিত্তিতে (প্যানেলভূক্তদের মধ্য থেকে) সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন চূড়ান্ত করার বিধান পরিবর্তন করে তাদের সুপারিশ বিবেচনায় নিয়ে মনোনয়ন চূড়ান্ত করার বিধান করা হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে প্রণীত স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত কোনো অধ্যাদেশই নবম জাতীয় সংসদ অনুমোদন করেনি। ইউনিয়ন পরিষদ আইন থেকে প্রার্থীদের তথ্য প্রদানের বিধান রহিত করা হয়। সাংবিধানিক পদে বাছাই কমিটির মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান সম্বলিত অধ্যাদেশ অনুমোদন করা হয়নি।
দলীয়করণমুক্ত অরাজনৈতিক গণমুখী প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করা।	প্রশাসনে চরম দলীয়করণ চলছে এবং প্রশাসনকে গণমূখী করার লক্ষ্যে সংস্কারের কথা শোনা গেলেও অদ্যাবধি কোনো অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি। যোগ্যতা, জেষ্ঠ্যতা ও মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ ও পদোন্নতি এখনও হয় না। সাম্প্রতিক পাবনার ঘটনা প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের মনোবল ভেঙ্গে দিয়েছে এবং প্রশাসনে এক ধরনের বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে। প্রশাসন ক্রমান্বয়ে মেধাশূণ্য হয়ে যাচ্ছে এবং অযোগ্য ও অদক্ষরা পুরস্কৃত হচ্ছে। প্রশাসনিক কর্মকর্তারা অনেক ক্ষেত্রে নিরাপত্তাহীনতায় ভূগছে।
পুলিশ ও আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীসমূহকে রাজনীতির প্রভাবমুক্ত রাখা।	আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির তেমন উন্নতি ঘটেনি। পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে আগের মতোই দলীয় স্বার্থে এবং বিরোধীদের শায়েস্তা করার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।
প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীসভার সদস্য এবং সংসদ সদস্য ও তাদের পরিবারের সম্পদের হিসাব ও আয়ের উৎস প্রতিবছর জনসমক্ষে প্রকাশ।	দিনবদলের সনদে দুই দুইবার উল্লেখ করা সত্ত্বেও, তা করতে সরকারের অনীহা বোধগম্য নয়। সাম্প্রতিক সংবাদ সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ সম্পর্কে বলেন, সরকারের সবাই আয়কর দেন। আয়কর দেওয়ার সময় সম্পদের হিসাব দেওয়া হয়। নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিলের সময়ও সম্পদের হিসাব দেওয়া হয়েছে। যে কেউ ইচ্ছা করলে তা দেখতে পারে। তিনি বলেন, আমাদের হিসাব দিতে কোনো অসুবিধা নেই, সময় হলেই তা প্রকাশ করা হবে (*দৈনিক প্রথম আলো*, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১১)। এ কথা সকলেরই জানা যে, এনবিআর-এ জমা দেয়া আয়কর রিটার্নের কপি পাওয়ার অধিকার কারোরই নেই। এ ছাড়াও দিনবদলের সুস্পষ্ট অঙ্গীকার – সম্পদের হিসাব প্রতিবছর দিতে হবে এবং তা প্রকাশ করা হবে। বিরোধী দলও তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে সম্পদের হিসাব প্রদানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করলেও, তারা তা রক্ষা করেনি।
রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে শিষ্টাচার ও সহিষ্ণুতা গড়ে তোলা।	এক্ষেত্রে কোনো অগ্রগতিতো হয়ইনি বরং রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে অসহযোগিতার মানসিকতা, প্রতিশোধপরায়নতা ও অসহিষ্ণুতা বেড়েছে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের ওপর হামলা ও নির্যাতন ব্যাপকহারে বেড়েছে। নাম বদলের সংস্কৃতি এখনও অব্যাহত রয়েছে।
একটি আচরণবিধির প্রণয়ন।	মাননীয় সংসদ সদস্য সাবের হোসেন চৌধুরী কর্তৃক একটি আইনের খসড়া সংসদে উত্থাপন করা হলেও, সরকারের পক্ষ থেকে এ লক্ষ্যে কোনো উদ্যোগই পরিলক্ষিত হয় না। গণমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রাইভেট মেম্বারস বিল সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটি বিলটি আইনে পরিণত করার বিপক্ষে সুপারিশ করেছে।
অন্যান্য অগ্রাধিকার	
স্থানীয় সরকার	
ক্ষমতার বিকেন্দ্রায়ন করে ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পরিষদকে শক্তিশালী করা।	ক্ষমতার বিকেন্দ্রায়নের কোনো উদ্যোগই পরিলক্ষিত হয় না। বরং সকল দলীয় ও সরকারি ক্ষমতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। গণতন্ত্রের অন্যতম ভিত্তি হলো স্থানীয় সরকার যা দূর্বল থেকে দূর্বলতর হচ্ছে। সংসদ সদস্যদেরকে উপজেলা পরিষদের উপদেষ্টা এবং উপদেষ্টার পরামর্শগ্রহণ বাধ্যতামূলক করে পরিষদের ওপর তাঁদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যা স্থানীয় পর্যায়ে একটি চরম দ্বন্দ্বাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। সম্প্রতি মন্ত্রী পরিষদ উপজেলা পরিষদ আইন সংশোধন করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদেরকে মূখ্য নির্বাহী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে,

	যা এ দ্বন্দ্বকে আরো প্রকট করবে। একইসাথে উপজেলার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অনাস্থা প্রস্তাবের ক্ষেত্রে সরকার তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে। উপজেলা পরিষদ কার্যকর করার ক্ষেত্রে এসব পদক্ষেপ পর্বতপ্রমান বাধা। জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের কোনো উদ্যোগই লক্ষ্য করা যায় না, যা সংবিধান ও আদালতের রায়ের লঙ্ঘন। সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতি তথা চেকস এন্ড ব্যালেন্সেস পদ্ধতি উপেক্ষা এবং হাইকোর্টের *আনোয়ার হোসেন মঞ্জু বনাম বাংলাদেশ* মামলার রায় অমান্য করে স্থানীয় উন্নয়ন কাজে সংসদ সদস্যদের ব্যাপকভাবে জড়িত করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে তাঁদেরকে ১৫ কোটি টাকা সমপরিমাণের উন্নয়ন প্রকল্প সুপারিশের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ফলে ভারতের পঞ্চায়েতীরাজের পরিবর্তে আমাদের দেশে 'এমপিরাজ' সৃষ্টির চেষ্টা চলছে।
ইউনিয়ন পরিষদ হবে উন্নয়ন ও প্রশাসনিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু।	মেয়াদোত্তীর্ণ ইউনিয়ন পরিষদ এখন অনেকটা 'খোঁড়া হাঁসে'র সমতূল্য। ইউনিয়ন পরিষদকে সকল উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করার কোনো উদ্যোগই পরিলক্ষিত হয় না। সংসদ সদস্যদের পৃষ্ঠপোষকতায় দলীয় ব্যক্তিরা অনেকক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদকে অকার্যকর করে ফেলেছে।
নারীর ক্ষমতায়ন	
জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা ৩৩ শতাংশে উন্নীত করা।	জাতীয় সংসদে নারী আসন বৃদ্ধির কোনো উদ্যোগ এখনও নেওয়া হয়নি। সম্প্রতি সংসদে একটি নারী নির্যাতন প্রতিরোধ আইন পাশ করা হয়েছে।
প্রশাসন ও সমাজের উচ্চপদে নারীদের নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া।	প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে আরও কয়েকজন নারীকে পদায়ন করা হলেও, এ ব্যাপারে কোনো উল্লেখযোগ্য নীতিগত পরিবর্তনের কথা শোনা যায় না।
গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও অবাধ তথ্য-প্রবাহ	
সকল প্রকার গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও তথ্য-প্রবাহের অবাধ চলাচল সুনিশ্চিত ও সংরক্ষণ করা।	চ্যানেল ওয়ান এর সম্প্রচার বন্ধ করা হয়েছে এবং যমুনা টিভি অনুমোদন পায়নি। সংসদে পত্রিকার এবং টিভি সংবাদের সমালোচনা এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি প্রদান করা হয়েছে। *আমার দেশে*'র প্রকাশ বন্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও, আদালতের হস্তক্ষেপের ফলে তা কার্যকর হয়নি। পত্রিকাটির সম্পাদক বর্তমানে কারারুদ্ধ। তবে আশার বিষয়, মানহানির অভিযোগে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে সরাসরি গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির বিধান সম্প্রতি বাতিল করা হয়েছে।
তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ইগভর্নেন্স চালু করা।	তথ্য কমিশন পুনর্গঠন করা হয়েছে। তবে আইনটিকে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়নের জন্য তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায় না। ডিজিটাল বাংলাদেশ সৃষ্টির ব্যাপারে সরকারের ব্যাপক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, ই-গভর্নেন্স চালুর কোনো উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয় না। বস্তুত, অধিকাংশ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে নিয়মিত তথ্য আপডেট করা হয় না।
পরিবেশ ও পানি সম্পদ	
নদী খনন, পানি সংরক্ষণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী ভাঙ্গন রোধ, বনাঞ্চল ও জীব বৈচিত্র রক্ষায় ব্যবস্থা গ্রহণ।	ইদী খননের কোনো উদ্যোগের কথা আমরা শুনিনি, যদিও ভারতের সাথে সাম্প্রতিক চুক্তির অধীনে কিছু কিছু নদী খননের উদ্যোগ নেওয়া এবং এ লক্ষ্যে কিছু ড্রেজার কেনার কথা শোনা যায়। পানি, বায়ু দূষণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নতুন কোনো উদ্যোগ দেখা যায় না। জলবায়ূ পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশ যে ঝুঁকির সম্মুখীন তার সাথে খাপ খাওয়ানোর কোনো গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায় না, যদিও এ নিয়ে বছরখানেক আগে অনেক কথা শোনা গিয়েছিলো, যে উদ্যোগের লক্ষ্য ছিল মূলত বৈদেশিক সাহায্য আকর্ষণ করা। দক্ষিনাঞ্চলে জমির লবনাক্ততা ক্রমাগতভাবে ভয়াবহ আকার ধারন করছে। উদাহরণস্বরুপ, ১৯৭৩ সালে ৮ লাখ ৩৩ হাজার হেক্টর জমি লবনাক্ততার বিরুপ প্রভাবের কবলে থাকলেও, ২০০০ সালে তা বৃদ্ধি পেয়েছে ১০ লাখ ২০ হাজার হেক্টরে এবং ২০১০ সালে ১০ লাখ ৫৬ হাজার হেক্টরে। (*দৈনিক ইত্তেফাক*, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১১)। এ ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে তেমন কোনো উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়না।
শিক্ষা ও বিজ্ঞান	
শিক্ষাঙ্গণ সন্ত্রাস বন্ধ ও সেশন জট মুক্ত করা।	শিক্ষাক্ষেত্রে বড় সফলতা একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন, যা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তেমন কোনো কার্যকর পদক্ষেপ এখনও দেখা যায় না। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও সেসনজট অব্যাহত রয়েছে। বস্তুত, দলের ছত্র-ছায়ায় ছাত্রলীগ বেসামাল আচরণে এবং অপরাধী কার্যক্রমে লিপ্ত, কিন্তু ক্ষমতাসীন দল তাদের দায় নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করছে।
স্বাস্থ্য	
আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে প্রতিষ্ঠিত ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করা।	নতুন একটি স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো চালু করার উদ্যোগের কথাও শোনা যাচ্ছে। এ সকল ক্লিনিক চালুর ক্ষেত্রে মাননীয় স্বাস্থ্য উপদেষ্টা ইতোমধ্যে দলীয়ভিত্তিক নিয়োগের ঘোষণা দিয়েছেন।

উল্লেখ্য যে, নির্বাচনের পর পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনা ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত এক জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনে ভাষণ দেন। সংবাদ সম্মেলনে তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেন যে, আমাদের সরকার হবে সকলের। আমরা ক্ষমতার অপব্যবহার করবো না। আমরা প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না। আমরা হানাহানির রাজনীতি পরিহার করতে চাই। আমরা বিরোধী দলকে সংখ্যা দিয়ে বিচার করব না। আমরা বিরোধী দলকে ডেপুটি স্পিকারের পদ দেব। রাজি থাকলে বিরোধী দল থেকে মন্ত্রী করার ইচ্ছাও তিনি প্রকাশ করেন। তিনি দেশে এক নতুন রাজনৈতিক

সংস্কৃতি উপহার দেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এছাড়াও তিনি দারিদ্র্যকে ‘সবচেয়ে বড় শত্রু’ হিসেবে আখ্যায়িত করেন (*দৈনিক প্রথম আলো*, ১ জানুয়ারি, ২০১০)।

সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, ‘আসুন, সব ভেদাভেদ ভুলে দেশের মানুষের জন্য একসঙ্গে কাজ করি। সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দলও রাষ্ট্র পরিচালনার অংশীদার। বিরোধী দলের ইতিবাচক সমালোচনা, পরামর্শ এবং সংসদকে কার্যকর করতে তাদের ভূমিকা ও মর্যাদাকে সমুন্নত রাখব।’ তিনি দলীয় নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, ‘যেহেতু বিজয় অর্জন করেছি, তাই ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে হবে।’ তিনি বলেন, বিজয়ের আনন্দে আত্মহারা না হয়ে সংযত থাকতে হবে। জনসেবার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। কিন্তু সরকারের মেয়াদের দুই বছর পার হওয়ার পর এসকল অঙ্গীকার বহুলাংশে অপূর্ণই রয়ে গিয়েছে।

সরকারের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা হলো নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ার ক্ষেত্রে। বর্তমান সরকারের আমলে রাজনৈতিক সংস্কৃতির ইতিবাচক পরিবর্তন তো হয়ই নি, বরং তার অবনতি ঘটেছে। প্রতিপক্ষের প্রতি অসহিষ্ণুতা ও প্রতিহিংসাপরায়নতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আরেকটি ব্যর্থতা হলো দুদককে শক্তিশালী করা এবং দুর্নীতি দমনের ক্ষেত্রে। সরকার দ্রব্যমূল্যও স্থিতিশীল রাখতে এবং দারিদ্র্য উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস করতে পারেনি। আইনশৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনীকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার এবং প্রশাসনের দলীয়করণ অব্যাহত রয়েছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরকারের ব্যর্থতা চরম। সকল সরকারি কার্যক্রম যেন দলীয় স্বার্থে পরিচালিত হচ্ছে। দলতন্ত্র ও ফায়দাতন্ত্রের চর্চা, পশ্চাৎমুখীতা, শ্লোগান আওড়ানো, ব্যক্তিপূজা, গোষ্ঠীপূজা, মৃতের আরাধনা, প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার প্রচেষ্টা, সবকিছুতেই অতি দলীয়করণ ইত্যাদি যেন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছে। বিরাজমান অপশাসনের বর্ণনা দিতে গিয়ে সম্প্রতি বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান বলেছেন, দেশ এখন বাজিকরদের হাতে। ভর্তিবাজি, নিয়োগবাজি, টেন্ডারবাজি, দলবাজি, মতলববাজির রকমফের দেখে মানুষ দিশেহারা।

তবে সরকারের এখনো তিন বছর সময় বাকী রয়েছে এবং এটি আশা করা অযৌক্তিক হবে যে, দুই বছর মেয়াদকালে সরকার সবগুলো অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবে। অনেকগুলো সমস্যা সমাধানের জন্য পুরো পাঁচ বছরের মেয়াদকাল, এমনকি তার বেশি সময়ও লাগতে পারে। তবে গত ২৪ মাসে সরকার কতগুলো প্রাথমিক কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজার বা জনগণের আস্থা অর্জনকারী কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারতো। যেমন, ক্ষমতাধরদের সম্পদের হিসাব প্রদান, একটি আচরণবিধি প্রণয়ন, সরকারি দলের মদদে সন্ত্রাস-চাঁদাবাজি-দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, দলতন্ত্র ও ফায়দাতন্ত্রের চর্চার অবসান, দুর্নীতি দমন কার্যক্রমকে জোরদারকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সরকার এ সকল ক্ষেত্রে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে, ফলে ব্যাপকভাবে জনসমর্থন, বিশেষত তরুণ ও সচেতন নাগরিকদের সমর্থন হারিয়েছে, যদিও এরাই মহাজোট সরকারকে মহাবিজয় উপহার দিয়েছিল।

সরকারের অবশ্য অনেকগুলো সফলতা রয়েছে। সবচেয়ে বড় সফলতা যুদ্ধাপরাধের বিচার প্রক্রিয়া শুরুর ক্ষেত্রে। বঙ্গবন্ধু হত্যার রায় বাস্তবায়ন এবং ২১শে আগস্টের বর্বরোচিত ঘটনার পুনঃতদন্তও সরকারের সফলতার অংশ। এছাড়াও কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাপক ভর্তূকি প্রদান করা হয়েছে। একটি শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছে, যদিও এটির বাস্তবায়ন এখনও বাকি। জঙ্গীবাদ দমনে সরকার কঠোর অবস্থান নিয়েছে। দারিদ্র্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে বড় সফলতা হলো সামাজিক ও খাদ্য নিরাপত্তার বেষ্টনীর আওতায় ব্যাপকহারে খাদ্যশস্য বিতরণ, যদিও এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন কৌশল হতে পারে না। সরকার জ্বালানী ও বিদ্যুতের সমস্যার সমাধানে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এবং এক্ষেত্রে কিছু সফলতাও অর্জিত হয়েছে। তবে এ সমস্যা সমাধানের জন্য আরও সময়ের প্রয়োজন হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষেও সরকার অত্যন্ত সচেষ্ট। সরকারের আরও অনেকগুলো সফলতা আছে, যা বহুলাংশে ধারাবাহিকতার সাফল্য। উদাহরণস্বরূপ, শিশুমৃত্যুর হার হ্রাসের কারণে সাম্প্রতিক এমডিজি সামিটে বাংলাদেশ একটি বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক পুরস্কৃত এবং এ ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে ব্যাপক প্রচার প্রচারণা চালানো হলেও, এটি ছিল মূলত ধারাবাহিকতার সফলতা।

নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেন বলেছেন, জোড়াতালি দিয়ে দিনবদল হবে না। গতানুগতিক প্রচেষ্টার দ্বারাও দিনবদল হয়না। দিনবদল করতে হলে সামগ্রিক অবস্থার উন্নয়ন ও পরিবর্তন করতে হবে। হতাশাব্যঞ্জক হলো যে, দিনবদলের সনদ বাস্তবায়নে সরকার যেন পরিকল্পিত ও প্রয়োজনীয় পেশাদারিত্বের ভিত্তিতে অগ্রসর হতে পারেনি। এ জন্য কোনো ‘ওয়ার্কপ্লান’ বা কর্মপরিকল্পনা তৈরি করেনি। সরকার পারেনি দলের জেষ্ঠ্য নেতৃত্ব ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি মনিটরিং বা পরিবীক্ষণ পদ্ধতি ও কাঠামো দাঁড় করাতে। এছাড়াও সরকারের প্রায় সব উদ্যোগই খণ্ডিত (piecemeal) ও অপরিকল্পিত (adhoc)। বস্তুত, সরকারের মেয়াদের দুই বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও দিনবদলের সূচনাই হয়নি বলে অনেকের আশঙ্কা। কারণ দিনবদল মানে উল্লম্ফন বা আমুল পরিবর্তন। উপরন্তু সরকারের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের কথাবার্তা থেকে মনেই হয় না যে, দিনবদলের সনদ বাস্তবায়ন এখন সরকারের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার – এটি যেন তাদের ‘রাডার’ থেকে সরে গিয়েছে। সরকার ইতোমধ্যে অনেকগুলো ফ্রন্ট খুলে বসেছে এবং অনেকগুলো অপ্রাসঙ্গিক কুটতর্কে লিপ্ত হয়ে পড়েছে, যদিও সত্যিকারের দিনবদলের জন্য একটি ব্যাপকভিত্তিক জাতীয় ঐক্য আবশ্যক।